আসুন আমরা শিক্ষা ও সেবার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলি

পবিত্র রমজান মাস চলছে। প্রত্যেক মুসলমান যার যার সাধ্যমতো পরকালের কল্যাণে ব্যস্ত। রোজা রাখা, তারাবির নামাজ পড়া, দোয়া-দরুদ পড়া, খারাপ কাজ ও কুচিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা, সবই পরকালের কল্যাণের জন্য। এছাড়া সাধ্যমতো দান-খয়রাত করা, ফিতরা দেওয়া, জাকাত দেওয়া, গরিব-মিসকিনের খাবারের ব্যবস্থা করা– এসবও পরকালের জন্য ইবাদত তো বটেই; উপরন্তু এ ধরনের ইবাদতে সমাজের সুবিধা-বঞ্চিত গরিব-মিসকিন ইহকালেই আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

ইসলাম দুনিয়া ও আখেরাত উভয় সময়ের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চায়। সেমতো পবিত্র কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে আমরা প্রতিনিয়ত মোনাজাত করি, 'হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখেরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (সুরা বাকারা: ২০১)। আমরা প্রতিবার মোনাজাতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাচ্ছি কেন? নিশ্চয়ই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য। দুনিয়াতেও তো কখনো কখনো আমরা জাহান্নামের আংশিক কষ্ট ভোগ করি। প্রশ্ন আসে, আখেরাতের কল্যাণের আগে দুনিয়ার কল্যাণই-বা চাচ্ছি কেন? দুনিয়ার কল্যাণ অর্জন না করতে পারলে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের প্রশ্নই আসে না। দুনিয়া আছে বলেই আখেরাত আছে। দুনিয়ায় কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ ছাড়া আখেরাতের ভালো কর্মফল দুঃসাধ্য। দুনিয়ার সময় অল্প, কিন্তু অতি মূল্যবান। দুনিয়ার কর্মজীবন যদি এত তুচ্ছ ভাববো, আখেরাতে ভালো কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র। দুনিয়ার কল্যাণের মধ্যেই আখেরাতের কল্যাণ নিহীত।

স্রষ্টা মানুষকে ইবাদত করার জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ইবাদত বলতে আমরা কি বুঝি? ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা শব্দটা ব্যবহার করলেও ইবাদত শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। তাই আমাদের ইবাদতটাও গোলমেলে হয়ে গেছে। দুনিয়াদারির সব কাজই ইবাদত, শুধু সমাজ ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ কিছু খারাপ কাজ বাদে। আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ করবো না, আবার পরকালে ভালো ফল-প্রতাশী হবো, তা কি হয়?। এ থেকেই চালাক-চতুর মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে, অল্প কর্মে অধিক লাভের প্রবণতা। যত পারো অন্যায়, মিথ্যা, অকাম-কুকাম করো, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে টাকার প্রাসাদ গড়ো; সব শেষে বারবার হজ ও ওমরাহ করে পাপমোচন করে নাও– এই মনোভাব। এর ভালো-মন্দ নিয়ে প্রত্যেক মানুষের বিবেকই সঠিক উত্তরটা দিতে পারে। মূলত দুনিয়ায় কল্যাণ অর্জন এত সহজ নয়, আবার ইসলামের মূল নীতিমালা মেনে চললে খুবই 'সহজ-সরল পথ'। সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ। মোটামুটি বুদ্ধিজ্ঞান হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুচিন্তা ও সুকর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পরকালের কল্যাণ লাভ। পরকালে পুরো কর্মজীবনের হিসেব দিতে হবে। এ জন্য দুনিয়ায় দুটো শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে: একটা শ্রেণি দুনিয়ার অন্য কোনো ভালো কাজ না করে শুধু নামাজ-রোজা করে জীবন কাটিয়ে দিয়ে বেহেশত পাবার চেষ্টা করে; অন্য শ্রেণি, দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে নিষিদ্ধ-অন্যায় কাজগুলো করে ইহকালের সুখ-সাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে, সম্পদের পাহাড় গড়ার চেষ্টা করে। শেষ বয়সে পরকালের জন্য বেশি নামাজ-রোজা, মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরিতে দানের কাজে কিছু অর্থ ব্যয় করে আয়েসের সাথে বেহেশত যাবার প্রচেষ্টা চালায়।

স্রষ্টা দুনিয়ার কাজ-কর্মে স্বচ্ছতা রাখার জন্য এবং খারপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য 'জীবন বিধান' পাঠিয়েছেন। সেই মতো তাঁর দেখানো পথে চলতে হবে। দুনিয়াদারিতে অংশ নিতে হবে। এই দুনিয়াদারির মাধ্যমেই খোদার ইবাদত। কোনো রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করে একজনের অপকর্মের সাজা প্রদান করার ক্ষমতা রাখে। সৃষ্টিকর্তা শুধু কর্ম-অপকর্মেরই হিসাব রাখেন না, প্রত্যেক মানুষের প্রতিটা মুহূর্তের চিন্তা-চেতনারও হিসাব রাখেন। তারপর পরকালে তার চিন্তা ও কাজের বিচারের কথা বলেন। কর্ম এবং চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বলেন। দুনিয়াদারির জন্য কর্ম; কর্মের মাধ্যমে ধর্ম পালন। পরকালে কোনো ধর্ম নেই। ধর্মের দুটো অংশ: পরকালের জন্য কয়েকটা বিষয়ের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস এবং ইহকালের জন্য প্রকৃতি ও ভালোভাবে বাঁচার প্রয়োজনে প্রাকৃতিক নিয়মের সহগামী কাজকর্ম। প্রকৃতির প্রতিটা নিয়মই বিজ্ঞান। প্রতিটা সৃষ্টি বেঁচে আছে, কর্ম করছে, আহার সংগ্রহ করছে, নড়াচড়া করছে, ভাবছে, প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করছে– পদে পদে বিজ্ঞান। মহাশক্তির এ খেলার সমীকরণ মেলানো অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী, যাকে আমরা মানুষ বলি, তার পক্ষে পুরোটাই অসম্ভব।

রোজার মাসে এসব কথা প্রাসঙ্গিক হবে বলেই সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি। মানুষ হিসেবে এ বিশ্বে সুখ-শান্তিতে, মানুষের মত বেঁচে থাকা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং পরকালের মুক্তি মাত্র দুটো জিনিস দিয়ে সম্ভব, যা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ও চিন্তা-চেতনায় অবহেলিত। এ দুটোকে একসাথে বেছে নিয়েছে এমন সম্প্রদায় বা জাতির সংখ্যা এ বিশ্বে নগন্য। অনেকেই

যে কোনো একটাকে বেছে নিয়েছে। তাই তারা একদিকে সফলকাম হচ্ছে। এ দুটোকে একসাথে বেছে নিতে হলে প্রথমেই পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ, সংঘাত, বিভাজন, ব্যক্তি স্বার্থপরতাকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। অন্যদিকে ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম শিক্ষাকে সৃষ্টিসেরা মানুষের জন্য, জীবনের উন্নতির জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআনেও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেইসব বধির ও বোবা যারা কমন-সেন্স (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বা বোধশক্তি)-কে কাজে লাগায় না' (সূরা আন ফাল, ৮:২২)। বলা হয়েছে, 'পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (সূরা আল আ'লাক, ৯৬:১)। এখানে পড়া বলতে শুধু আরবি অক্ষর চিনে শব্দ উচ্চারণ করা নয়। পড়া মানে বিষয়টা বুঝতে পারা, জানা, হৃদয়ঙ্গম করা ও ভাবা, আমরা যাকে বলি জ্ঞানার্জন করা। কী পড়তে হবে? কুরআন। কুরআনে কী লেখা আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, মানুষ ও জীবজন্তুর সৃষ্টি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অস্ত্রচিকিৎসা, ভূ-তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স), স্রষ্টার পরিচয় ইত্যাদি– বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং মানুষ সৃষ্টি ও এর পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য যা দরকার সে-সব বিষয়। উল্লিখিত এসব বিষয়ের জ্ঞানকে বাদ দিলে কুরআন পড়া হয় কীভাবে? দুনিয়াই-বা চলে কীভাবে? অথচ আমরা কুরআনে উল্লিখিত বিষয়ের প্রায়োগিক জ্ঞানকে দুনিয়াদারির কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক। এসব বিষয়ে জ্ঞানী (আলেম) ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার অবকাশ রয়ে গেছে। শিক্ষা অর্জন ও মানুষকে শিক্ষাদান, শিক্ষায় সহায়তা করা, শিখতে উপদেশ দেওয়া শ্রেষ্ঠ ইবাদতের একটি। তেমনিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে দুনিয়াদারি করার জন্য সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সেবা করাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যার নাম মানবসেবা।

এদেশের জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগই মুসলমান। উপরে বলা এসব কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। কিন্তু পালন করতেই যত গাফিলতি ও উদাসীনতা। আমরা কী এক অজানা অন্ধস্রোতে গা ভাসিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে সামনে ধেয়ে চলেছি! আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। গ্রামে-গঞ্জের অধিকাংশ মানুষ কর্মজীবী। হাতে গোনা নির্দিষ্ট একটা অংশ জটিল-কুটিল রাজনীতিতে অংশ নিয়ে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যবিচ্যুত করে ছাড়ছে। আবার রাজনীতিতে ভালো মানুষ যে একেবারেই নেই, তাও নয়। বলা যায়, দলে তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অথচ দেশটা গড়া খুবই একটা সহজ কাজ। সহজ একটা পথ আছে। রাজনীতিকদের সাহায্য-সহযোগিতা পেলে ভালো; না পেলেও ক্ষতির কোনো কারণ নেই। দরকার মানসিকতার উৎকর্ষ। শিক্ষা এবং মানবসেবার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলেই সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। যত অন্যায়-অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়। সমাজ উন্নত হয়, অভাব-দুর্দশা দূর হয়, মানসিক পেরেশানি, অন্ধ প্রতিযোগিতা দূরে পালায়, সমাজ বাসযোগ্য হয়; পরিণামে কাজের মাধ্যমে স্রষ্টার ইবাদত হয় এবং পরকালের কল্যাণ সাধিত হয়। বুঝতে হবে ইসলামে সর্টকাট রাস্তায় বেহেশত পাবার কোনো পথ নেই, যা পেতে আমরা অনেক বুদ্ধি ও টাকা খরচ করি। ইসলামি জীবনব্যবস্থা একটা পথ, কর্মের মাধ্যমে উপাসনা বা ইবাদত একটা পাথেয়। অন্য অনেক ধর্মের মানুষও ভালো কর্মে ও পরকালকে বিশ্বাস করে। তারাও ভালো কর্মের আশ্রয় নিতে পারেন। আমরা প্রতিহিংসা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, 'মুখে মধু পেটে বিষ' মানসিকতা, স্বার্থের জন্য আত্মপ্রবঞ্চনাকে বাদ দিতে পারি। ভালো গঠনমূলক কিছু করার জন্য মানুষের ইচ্ছেশক্তিই যথেষ্ঠ। এর জন্য কোনো টাকা-পয়সা খরচ করাও লাগে না। নিজের বিবেককে পরিশুদ্ধ করলেই হয়। বারবার রমজান আসছে, রোজা পালন করছি; কিন্তু রোজা থেকে আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণটা দূরে ঠেলে দিচ্ছি। আমাদের ধর্মপালন অনেকটা লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। আমরা ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান, অথচ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ও কর্মে ক্রমেই উদাসীন ও নীতিবিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করলেই সত্য বেরিয়ে আসে।

এ বিষয়ে আজ একটা কর্মপন্থার পরামর্শ দিতে পারি। এদেশের প্রতিটা জনপদে বা গ্রামে অনেক সুশিক্ষিত নামাজি ব্যক্তি আছেন। তারা সমমনা বিবেচনা করে প্রতিটা জনপদে বা গ্রামে একটা করে স্বেচ্ছাসেবী টিম তৈরি করতে পারেন। তাদের প্রত্যেকের কাজই হবে মানুষকে সুশিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা, সাধ্যমতো অন্যান্য জনসেবা করা। টিম তৈরি নিয়ে, লীডার হওয়া নিয়ে দলাদলি করার প্রয়োজন নেই। আপনি তো নেতা হওয়ার জন্য কাজ করছেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন। মানুষকে সুশিক্ষিত করা ও মানুষের সেবা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো রাজনীতি, কুটিল-জটিল যে কোনো চিন্তা এড়িয়ে যেতে হবে। মানুষ সারাদিন বড়জোর আট থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করে। বাকি সময় ইচ্ছে করলেই সমাজের অনেক সেবার কাজ করা সম্ভব। জানবেন, সমাজের যে কোনো ভালো কাজেই মুক্তি; ইহকালের ইবাদত ও মুক্তি এবং পরকালের কল্যাণ। একা একা সমাজের কোনো কাজ না করে 'টিম-ওয়ার্ক' করতে হবে। ক্রমেই টিমে সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। ইসলামে এমন অনেক কিছুকেই না করা হয়েছে। নিশ্চয়ই হিংসা-বিদ্বেষের

ক্ষতিকর কোনো দিক আছে। সমাজে শিক্ষক ও অভিভাবকদের ডেকে শিক্ষার উন্নতির কথা বলে শিক্ষা-সচেতন করে তুলতে হবে, আবার তাদের পরামর্শও নিতে হবে। সমাজের সাধারণ মানুষকে মাঝে-মধ্যেই সমাজ-উন্নয়নমূলক ও স্বাস্থ্য-সচেতনমূলক কাজে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সন্ধ্যার অবসর সময়ে বাংলা পড়িয়ে দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়ার অভ্যাস করানো যায়। এতে তাদের সমাজ-সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শিখবে। সমাজে ভালো কাজের অভাব নেই। এভাবে বেশ কিছুদিন চললে সামাজিক ভালো পরিবেশ ও সামাজিক শান্তি ফিরে আসবে। আমাদের বুঝতে হবে, ভোগের আনন্দ সাময়িক, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ অনাবিল ও দীর্ঘস্থায়ী। ইবাদতের আনন্দও দীর্ঘস্থায়ী। এই মানুষের মধ্যেই মানুষ রত্ন লুকিয়ে আছে। তাকে সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ দিয়ে তা বের করে আনতে হবে। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষা এমনই একটা বিষয় যে, সুশিক্ষিত মানুষ গড়তে পারলেই সমাজে এর ভালো প্রভাব পড়ে। দেশের উন্নতি হয়। খারাপ মানুষ প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না, শিক্ষা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজের উন্নতিতে আনন্দিত হয়ে ওঠে, ভালো মানুষের দোয়া পায়। মানুষের আর্থিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য করা যে কোনো কাজই ইবাদত।

আমার কয়েকজন সহকর্মী তারা একটা টিম গড়ে তুলেছেন। নিজেদের জাকাতের টাকা ছাড়াও পকেট থেকে আরো কিছু টাকা দিয়ে এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করে গরিব-অসহায়দের মধ্যে কাউকে বকনা গরু, কাউকে ছাগল, কোনো কর্মহীন মহিলাকে সেলাই মেশিন, কাউকে-বা রিক্সাভ্যান, ইজি বাইক কিনে দেন। এভাবে তাদের উপার্জন-সক্ষম করে তোলেন। উদ্যোগটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অসহায় কোনো ব্যক্তির চিকিৎসা খরচের দায়িত্ব নেওয়াটাও এক ধরনের সমাজসেবা। আসুন, আমরা সমাজে সুশিক্ষা প্রদান করি ও সমাজসেবায় এগিয়ে আসি।

(১৯ মার্চ ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ